মাতৃভাষাকে কে বাঁচাবে?

প্রশান্ত মৃধা

বাংলা ভাষা নিয়ে মধ্যবিত্তের এক প্রকারের আত্মশ্লাঘার ব্যাপার আছে। সেই শ্লাঘার মাত্রা আবার ফেব্রুয়ারিতেই বাড়ে সবচেয়ে বেশি। গানে, বইয়ে, আলোচনায়, স্মরণে সে এই সময়ে নিজেকে একেবারে ছেয়ে ফেলে। কিন্তু মধ্যবিত্তের এই (যেন হঠাৎ পাওয়া) আবেগকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সুমন চট্টোপাধ্যায় তার গানে যতোই গলা ফাটান, "ম" মানে মরবে না মাতৃভাষা।' তাতে মাতৃভাষার তেমন কিছু যায় আসে না; ওদিকে মধ্যবিত্তেরও না। এই গান মধ্যবিত্তের বিশ্বাসের অংশ না হয়ে হয়েছে শয্যার শিয়রসঙ্গীত। কোনো ভাষাকেই মধ্যবিত্ত বাঁচায় না, বাঁচানোর দায়িত্ব নেয় না। সেই দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ। বরং ভাষার হয়ে তারা ভাড়া খাটে, ভাষার উপরে উপচে পড়া দরদ বিক্রি করে বেঁচেবর্তে থাকে। তাই বাংলা ভাষার ওপরে আক্রমণে হোক বা শুভেচ্ছায়ই হোক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আসলে পালন করে সেসব মানুষ যারা আসলে জানেন না যে, তারাই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখছেন। তাদের মুখের ভাষা উপভাষা(?)। যেমন, সংখ্যায় কম কোনো জাতিকে আমরা বলে সুখ পাই উপজাতি, একইভাবে ওই ভাষা মাতৃভাষার অংশ হলেও তা উপভাষার মর্যাদার বেশি কিছু লাভ করেনি কোনো কালে বা ব্যাকরণ তাকে 'উপভাষা' আখ্যা দিলেও মধ্যবিত্তের কাছে চাষাভূষার ভাষা। তবু বোঝা যায়, বাংলা ভাষার সঙ্গে জমি জিরাত আর নদনদীর এমন সখ্য খুব কম ভাষাতেই আছে।

কিন্তু হঠাৎ ভাষার মরণ-বাঁচনের এই প্রশ্ন তোলা কেন? এই বছর, বাঙালি [না, বাঙালি মধ্যবিত্ত] তার ভাষার সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলো বলে? না কি ভাষা কোনো নতুন ঘাত ও প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এমনই ভাবে বহমান যে, তাকে এই মুহূর্তে বাঁচানোর জন্য কোনো সহৃদয় এগিয়ে না এলে ভাষাকে আর উদ্ধার করা যাবে না? —হতে পারে, নাও হতে পারে; এই মুহূর্তে হয়তো এর কোনো কোনোটা আমাদের জন্য সত্যি, কোনো কোনোটা আমাদের জন্য সত্যি নয়।

বিশ্বায়নের চাপে পড়ে তবে কি, বাংলা ভাষার নাভিশ্বাস উঠেছে? নাকি বাংলা ভাষা তার অবকাঠামোয় কোনো নতুনত্বের সন্ধানে নামতে পারছে না যে, তাকে এই মুহূর্তে আর টেনে তোলা যায়? বাংলা ভাষীদের দুটো রাজধানীর একটা নাকি অনেক আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। তার দেয়াললিখন, সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন কি ব্যক্তিগত চিঠি চালাচালির ভাষাও হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজি।– এই কথা ভেবে অন্য রাজধানীটির অধিবাসীরা এক প্রকারের স্বস্তি পান যে, নিজেদেরটার এখনো সে অবস্থা হয়নি! এই নিজেদেরটার এখনো সে অবস্থা হয়নি যারা ভাবেন, তাদের নাগরিকমণ্ডলীর বেশ মনে থাকে, সে রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন, তার ভাষার অর্জিত সাফল্যে এখন সারা পৃথিবীর মানুষ পালন করতে পারছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এই সব হিসাব-নিকাশ করে অনেকেই তৃপ্তি পান, তাদের তৃপ্তির এই ঢেকুরের কারণে আর যাই হোক ভাষা কিন্তু নতুন কোনো ব্যঞ্জনা পাচ্ছে না। নাগরিক মহলের সে ক্ষমতা নেই। তা দিতে পারে রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্রকে সে উদ্যোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এসব প্রাপ্তিতে তাই অপ্রাপ্তির ভাগটাই থেকে যাচ্ছে বেশি। এতোটাই বেশি যে, তাতে আন্তর্জাতিক কেন, আন্তঃগ্রহের বা গ্রহান্তরের একটি বিশেষ দিবস হলেও বাংলা ভাষার তেমন কোনো লাভ-লোকসান হতো না। রাষ্ট্রের এই উদ্যোগ নেওয়া না নেওয়ার ফাঁক গলে, সুযোগ সন্ধানীরা বিশ্বায়নের নামে ইংরেজির যে-আধিপত্য চাপিয়ে দিচ্ছে তাতেও বাংলা ভাষার দীনতা প্রকট হচ্ছে, হতেই থাকবে। ওদিকে শিক্ষা কি সরকারি চিঠি চালাচালির ভাষাও বাংলাকে করা যায়নি, আমন্ত্রণপত্রের ভাষাও হয়ে উঠছে ইংরেজি, এখন খালি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ভাষা ইংরেজি হলেই হয়; মহাভারতের কালে রাজপুত্র যুধিষ্ঠির ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় যে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেছিল আত্মরক্ষার তাগিদে, তেমনই রাজন্যবর্গ-আমলা-অমাত্য-সেনা কর্মকর্তাগণ তাদের কাছে বাংলার অবস্থান মহাভারতের কালের 'একটি প্রাকৃত ভাষা'র চেয়ে তেমন কোনো উন্নতি লাভ করেনি। তারা চিঠি লেখেন না, একজন অন্যের সঙ্গে কথা বলেন না, বা সহকর্মীকে শুভেচ্ছা কি অধঃস্তনকে গালি কোনোটাই দেন না বাংলায়। ওদিকে মধ্যবিত্ত ওৎ পেতে থাকে একটু সুযোগের, যে সুযোগের মহান সদ্ব্যবহার করে চলেছেন তাদের দৃষ্টিতে মহাজ্ঞানী-মহাজনরা [রাজন্যবর্গ-আমলা-অমাত্য-সেনা কর্মকর্তাগণ] মধ্যবিত্তের তো আশা আমলা হওয়া, সেনাকর্তা হওয়া, রাজনীতিকদের কাছাকাছি থাকা; ফলে, সেই থাকতে গিয়ে বাংলা থাকলো, কি ভাসলো, কি ডুবলো—তাতে 'মহাজন' হয়ে উঠতে চাওয়া মধ্যবিত্তের তেমন কিছু আসে যায় না; যায়নি কোনোকালেই খুব একটা, অন্তত স্বাধীনতা-উত্তর রাজধানীকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের তো বটে।

এখানে খুব সুবিধায় ও সহজে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, জাতীয় সব ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ তো সবচেয়ে সচল। মধ্যবিত্তই চেতনের সেই অংশগ্রহণকে তৈরি করে, যা পরে নিম্নবিত্তকে পথ দেখায় আর উচ্চবিত্তকে আমজনতার কাতারে শামিল হতে বাধ্য করে। এ কথা সত্যি। এবং এই কথা বিশ্বাস করার লোকের অভাবও হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ও তার দুই দশক পর থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই পেড়ে এই চেতন থেকে দূরে সরে যাওয়া মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখন এই দেশে নেহায়েত কম নয়।

গত মাস ছয়েকে অন্তত তিন কি চারটা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র দেখেছি যার ভাষা ইংরেজি। তার কোনোটার অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি সেখানে কোনো অবাংলাভাষী আসেননি অথবা আসেননি বাংলা জানেন না এমন কেউ। কোনোভাবেই আমার বোধে কুলায়নি কী কারণে এই সমস্ত আমন্ত্রণপত্র ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে।

সেই উদাহরণে যেতে গেলেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণার দরকার, যা অন্য অর্থে ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টির হয়ে উঠছে, প্রবণতা তো তাই বলে।

আমাদের ভাষা নিজেকে আর প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে রাখতে পারছে না, তার বড়ো প্রমাণ প্রতিদিনই ঢাকার রাস্তার দুকূলের সাইনবোর্ড বদলে যাচ্ছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এই সাইনবোর্ডের ভাষা পড়বার ক্ষমতা রাখে না এমন মানুষ অধ্যুষিত একটি শহরের সাইনবোর্ড দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে তাদেরই চোখের সামনে। তাতে শিক্ষিত কি আধা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তেমন কিছু আসে যায় না। এসে যায়নিও কোনোকালে। ইংরেজি তাদের কাছে আধুনিক হওয়ার ভাষা। এতোটাই আধুনিক হওয়ার ভাষা যে, সেই মধ্যবিত্তের কাছে, পুনর্মিলনী, জন্মদিন কি বিয়ে নিমন্ত্রণপত্রের ভাষাও হয়ে উঠছে ইংরেজি। এমনতর কয়েকটি উদাহরণ:

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো বিভাগের বিভিন্ন প্রকার আমন্ত্রণপত্রের ভাষা হয়ে উঠেছে ইংরেজি, যদিও সেই অনুষ্ঠানে একজনও অবাংলাভাষীর আগমন ঘটবে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে, কেন আমন্ত্রণপত্রের ভাষা ইংরেজি, জানতে চেয়ে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

২. গত মাস ছয়েকে অন্তত তিন কি চারটা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র দেখেছি যার ভাষা ইংরেজি। তার কোনোটার অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি সেখানে কোনো অবাংলাভাষী আসেননি অথবা আসেননি বাংলা জানেন না এমন কেউ। এই সমস্ত নিমন্ত্রণপত্রের একটি একজন গদ্য লেখকের বিয়ের, একটি একজন কবির কন্যার বিয়ের, একটি একজন কলেজ শিক্ষকের ছেলের বিয়ের, একটি একজন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ তরুণের বিয়ের। কোনোভাবেই আমার বোধে কুলায়নি কী কারণে এই সমস্ত আমন্ত্রণপত্র ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, বেশ কিছুদিন আগে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি রম্য রচনায় তার অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছি : পুরান ঢাকার একজন ব্যবসায়ী তার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এসেছে, মনজুরুল ইসলাম উল্টে-পাল্টে দেখছেন, তাতে ব্যবসায়ী বললেন, স্যার কোনো ভুল আছে? মনজুরুল ইসলাম বললেন, না, খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু বিদেশী কেউ আসবে কী? ব্যবসায়ী হেসে বলেন, না স্যার তাগো সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নাই [এই বিদেশী মানে ব্যবসায়ী বুঝেছেন পাকিস্তানি]। এরপর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বললেন, তা হলে ইংরেজি কেন? ব্যবসায়ী হেসে উত্তর দেন, স্যার একটা পেসটিজ আছে না। ভালো কথা, ওই ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ইংরেজিতে নিমন্ত্রণপত্র সম্মানের হতে পরে, তিনি লেখাপড়া জানেন না, তাই ছেলেমেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ইংরেজিতে লিখতে পারেন, সেটা তার অভিলাষের অংশ, নিজের অবস্থানকে (জাতে ওঠা) প্রমাণ করার অংশ, কিন্তু যাদের আমন্ত্রণপত্র আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের কাছে?

নিজেকে প্রকাশের এই সামান্য সুযোগে, বা মহার্ঘ সুযোগে, যেখানে বিয়ের মতো রীতি ও সংস্কৃতিকে মান্য করার বিষয়, সেখানেই বাংলা আর যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াচ্ছে না; হয়তো তার সেই ভাষিক ক্ষমতা নেই (?)! নেই বলেই, মধ্যবিত্তকে নিতে হচ্ছে ইংরেজির আশ্রয়? নাকি এক্ষেত্রেও ইংরেজি 'জাতে ওঠা'র রাস্তা? তা হতে পারে। কিন্তু তাতে, ভাষা হিসেবে বাংলার শুধু অপমানই নয় কিংবা 'সর্বস্তরের বাংলা'র মতো স্লোগানকে ফানুশ বানিয়ে উড়িয়ে দেওয়া শুধু নয়, মধ্যবিত্তের টলায়মান অবস্থানের সবচেয়ে বড়ো প্রকাশ। তাই, মাতৃভাষা বাংলা, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পাওয়ায় যতো বড়ো সম্মানই লাভ করুক না কেন তাকে বাঁচানোর জায়গা কিন্তু দিনকে দিন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সেই দায়িত্ব থেকে মধ্যবিত্তের আরো দ্রুত সরে যাওয়াই কিন্তু আশঙ্কার ও জিজ্ঞাসার, মাতৃভাষাকে কে বাঁচাবে?

প্রশান্ত মৃধা : লেখক।

FEB 24 2000